OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 548 - 557
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 548 - 557
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

ইতিহাসের নির্মাণ : রক্তকরবী ও মুক্তধারা

ড. কৌশিককুমার দত্ত
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ মঙ্গলকোট, পূর্ব বর্ধমান
Email ID : koushikduttaphd@gmail.com

Received Date 10. 04. 2025
Selection Date 23. 04. 2025

Keyword
Ugra-jatiyatabad, Samrajyabad, Punjibad, Dharmaghat, Karshanjibi, Akarshanjibi, Overtime, Shishushramik, Jatibiddesh.

Abstract

The extreme nationalism of the First World War and the capitalist imperialism transformed commonman's life into a nightmare. To emancipate humanity from this condition, Rabindranath Tagore has composed two plays named 'Muktadhara' (1922) and 'Raktakarabi' (1924) keeping in mind both the national and international contexts. In both the plays, Tagore has not only dismantled the ill-effects of capitalism, imperialism, and extreme nationalism, but he has also referred to the path of freedom from the oppression. In the play 'Raktakarabi', Tagore has portrayed how Modern European capitalism has controlled nature and human civilization through the use of scientific knowledge and technological advancement. This capitalism has also become the apparatus for control and exploitation. By portraying the socio-economic politics of the mining area, Tagore has dismantled the harsh reality of capitalism. He has also referred to the dialectical relationship between the labour and master societies. In the play 'Muktadhara', Tagore has shown how extreme nationalism negatively affects trust and humanity. Using the advantage of geographical positioning, a country tries to take control over its neighbouring country by restricting the necessary water flow. King Ranajit does not trust his uncle Biswajit; the civilians do not trust their king; the army general cheats Avijit; Bhibhuti is suspicious about his spies and creates an environment of mistrust. These pictures represent the ill-effects of extreme nationalism. This play also portrays how extreme nationalism transforms human beings into animals and thus creates history.

Discussion

১৯১৪-১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এই যুদ্ধের কারণ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতবিরোধ আছে। কোনো বড় যুদ্ধ একটি বা দুটি কারণে সংঘটিত হয় না। এর পেছনে বহু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্যা জড়িয়ে থাকে। প্রসঙ্গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ হিসেবে যে বিষয়গুলিকে ইতিহাস বিশেষজ্ঞরা মনে করেন তা হল — অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদ, উগ্র-জাতীয়তাবাদ, বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা তথা পুঁজিবাদ, ঔপনিবেশিক বিস্তার তথা সাম্রাজ্যবাদ, পরস্পর বিরোধী শক্তি জোট গঠন, সামরিক প্রতিযোগিতা, আন্তর্জাতিক সংকট,

ইয়োলো জার্নালিজম প্রভৃতি। উনিশ শতকের শেষভাগ ও বিশ শতকের সূচনায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে একধরনের উগ্র, স্বার্থপর ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব হয়। সমস্ত জাতি গোষ্ঠীরা নিজের দেশ ও জাতিকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতে থাকে এবং অন্য জাতিকে পদানত করে নিজের নিজের দেশ ও জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়। ফলে ইউরোপের বিভিন্ন জাতির মধ্যে একধরনের বিদ্বেষ ও জাতি বৈরিতার সৃষ্টি হয়। একশ্রেণির সাংবাদিক ও সাহিত্যিক এই ধরনের উগ্র, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ প্রচার করতে থাকেন। জার্মান উপনিবেশবাদের প্রবল সমর্থক ইতিহাসবিদ হেনরিখ ভন ট্রিটস্কে প্রমুখ প্রচার করেন যে জার্মানির টিউটনিক জাতি হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। জার্মান দর্শনবিদ হেগেল বলেন রাষ্ট্রই ঈশ্বর এবং রাষ্ট্রের গৌরবে জাতির গৌরব। আমেরিকান লেখক হোমার লি অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জর্জ বেঞ্জামিন ক্লেমাঁসু প্রমুখ ফরাসি নেতা ফরাসি জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে ঘোষণা করেন ফরাসি সভ্যতার সঙ্গে টিউটনিক সভ্যতার সংঘর্ষ অনিবার্য। এভাবে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, ইতালি, জাপান প্রভৃতি পৃথিবীর ক্ষমতাশালী দেশগুলিতে উগ্র ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ প্রচারিত হয়ে পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের আবহাওয়া তৈরি করে।

ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দিতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। শিল্প বিপ্লবের ফলে দেশীয় শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের হাতে প্রচুর মূলধন সঞ্চিত হয়। এই মূলধন বিনিয়োগের জন্য বাজারের প্রয়োজন হয় তাই উদ্বৃত্ত পণ্য বিক্রি, কারখানার কাঁচামাল সংগ্রহ এবং বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের শিল্পপতি ও পুঁজিপতিরা উপনিবেশ বিস্তারের জন্য নিজ নিজ দেশের সরকারের ওপর চাপ দিতে থাকে এভাবেই সর্বত্র পুঁজিবাদী সভ্যতার উন্মেষ ঘটে এবং পুঁজিবাদ বিশ্বযুদ্ধের পট প্রস্তুত করে।

বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় –

> “সর্বস্লাভ আন্দোলনের নেতা সার্বিয়া চাইছিল তার নেতৃত্বে স্লাভ রাজ্যগুলির ঐক্য প্রতিষ্ঠা। বার্লিন চুক্তিতে স্লাভ জাতি অধ্যুষিত বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার ওপর অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কিছুদিন পর অস্ট্রিয়া এই স্থান দুটি নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে। এই স্থান দুটির অধিবাসীরা সার্বিয়ার সঙ্গে সংযুক্তির পক্ষে ছিল। তারা এই উদ্দেশ্যে আন্দোলন শুরু করলে, সার্বিয়া তাদের মদত দেয় এবং এইভাবে বলকানে অস্ট্রিয়া - সার্বিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। বার্লিন চুক্তিতে বুলগেরিয়াকে ত্রিধাবিভক্ত করায় বুলগাররা, এবং রোমানিয়ার কিছু অংশ রাশিয়ার হাতে যাওয়ায় রুমানিয়রা ক্ষুব্ধ হয়। ম্যাসিডোনিয়ার অধিকার নিয়ে গ্রীস, সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ার দ্বন্দ্ব প্রবল আকার ধারণ করে।”[১]

আর এভাবেই অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদ সমগ্র ইউরোপ জুড়ে যুদ্ধের আবহ তৈরি করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বিপুল আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গান্ধীজীর আহবানে সাড়া দিয়ে ভারতবাসী সক্রিয়ভাবে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

> “প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ ভারতীয় সেনা বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধে অংশ নেয় এবং ১০ হাজার মৃত্যুবরণ করে। যুদ্ধ তহবিলে ভারতবাসীী ৬ কোটি ২১ লাখ পাউন্ড চাঁদা দেয়। ভারতবাসী আশা করেছিল যে যুদ্ধশেষে তাঁদের স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে, কিন্তু যুদ্ধের অবসানে দেওয়া হল ‘মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার’ যা ভারতীয়দের কাছে ছিল ‘তুচ্ছ বিরক্তিকর ও নৈরাশ্যজনক’। দাবি আদায়ের জন্য ভারতীয়রা অন্যপথ গ্রহণে বাধ্য হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেশবাসীকে চরম অর্থনৈতিক সংকটের মুখে ঠেলে দেয়। খাদ্যাভাব, মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারত্ব চরম আকার ধারণ করে। কাপড়, ওষুধ, চিনি প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। কৃষক স্বল্পমূল্যে মহাজনদের কাছে কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রি করতে বাধ্য হয়, আবার তাকেই অধিক মূল্যে শিল্পজাত দ্রব্য কিনতে হয়। শিল্পদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পায়নি। তাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে ভারতে ব্রিটিশ পণ্যাদির আমদানি বন্ধ হওয়ায় সরকার ভারতীয়দের শিল্প বিস্তারে উৎসাহ দেয়। কিন্তু

> যুদ্ধ শেষে সেগুলির ওপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে এবং নতুন শিল্প স্থাপনে বাধা দেয়। এইসব কারণে ভারতবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।"[২]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ভারতে শ্রমিক আন্দোলন সংগ্রামী চরিত্র ধারণ করে। দ্রব্যমূল্য প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে বেড়ে যায়। দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা প্রচুর মুনাফা অর্জন করে কিন্তু শ্রমিকশ্রেণি মজুরি বৃদ্ধি না পাওয়ায় তাদের অবস্থা হয় শোচনীয়। সাম্রাজ্যবাদী বেনিয়া শাসকের যুদ্ধোন্মাদনার দায়ভার বহন করতে হয় সাধারণ মানুষকে।

> "ব্রিটিশ সরকার এই সময় ভারতের শ্রমজীবী জনগণের উপর ট্যাক্সের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করে সমাজের দরিদ্রতম শ্রেণির চরম দুর্দশার সৃষ্টি করল। সামরিক ও অসামরিক শাসনের খাতে যে বিপুল পরিমাণ ব্যয়বৃদ্ধি ঘটল, তা উসুল করা হল জনগণের উপর কর বৃদ্ধি ও অন্যান্য রূপ শোষণকে আরো নির্মম করে।"[৩]

এছাড়াও সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ, হোমরুল লীগের সাফল্য, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ঐক্যপ্রয়াস এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রুশ বিপ্লবের সাফল্য শ্রমিকশ্রেণিকে নতুন সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ধারায় উদ্বুদ্ধ করে।

> "১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে জোয়ার আসে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে করাচির নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘট, জুন মাসে গ্রেট ইন্ডিয়া পেনিনসুলা রেলওয়ের ধর্মঘট এবং প্যারেলের কারখানায় পাঁচ হাজার শ্রমিকের কয়েকদিনের লাগাতার ধর্মঘট উল্লেখযোগ্য। এই বছরেই আরো কয়েক জায়গায় দীর্ঘস্থায়ী ভাবে রেল শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। বোম্বাই আমেদাবাদের বস্ত্র শিল্প শ্রমিক এবং ডাক বিভাগের শ্রমিকদের ধর্মঘট উল্লেখযোগ্য। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা পৌরসভা, বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্প, বাংলার খড়্গপুর রেল কারখানা, মাদ্রাজ ট্রাম ও বস্ত্র শিল্প এবং লক্ষ্ণৌ-এর রেল কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট দেখা দেয়।"[৪]

১৯২০ সালে শ্রমিক ধর্মঘটের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০। এই সময় থেকেই ভারতের শ্রমিক শ্রেণি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যে ভারতের শ্রমিক শ্রেণিও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করে। বোম্বাই, বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, বাংলা প্রভৃতি সর্বত্র পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও ধর্মঘট হতে থাকে। এই রকম একটি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে যেখানে একদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে সর্বত্র উগ্র জাতীয়তাবাদের বিষবাষ্প অন্যদিকে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। মানুষ এই অবস্থা থেকে চাইছে সর্বাত্মক মুক্তি, সেইরকম পেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দুটি নাটক 'মুক্তধারা' (১৯২২) ও 'রক্তকরবী' (১৯২৪, প্রবাসী) তে তুলে ধরেছেন পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও উগ্রজাতীয়তাবাদের নগ্ন ছবিটি। পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও উগ্রজাতীয়তাবাদের নগ্ন ছবিটি শুধু দেখানোই নয় তা থেকে পরিত্রাণের পথনির্দেশও করেছেন নাটককার রবীন্দ্রনাথ।

'রক্তকরবী' (১৯২৪) নাটকে আধুনিক পুঁজিবাদী সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতার ও সাধারণ মানুষের মুক্ত আত্মার ক্ষয়, সর্বশেষে যান্ত্রিকতার কারাগার থেকে মানুষের প্রাণশক্তির বিজয় অভিযানের কথা রূপক-প্রতীকের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। রক্তকরবীর রাজাও স্বাধীন নয় তাঁর সৃষ্ট শক্তির দ্বারাই সে নিয়ন্ত্রিত হয়। নাটকের শেষে রাজার মানবিক মুক্তি, অন্তরের রিক্ততা ও সর্দারদের দমন করতে যাওয়ার মধ্যে আছে তার-ই ইঙ্গিত। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিরা দুটি প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদের নিঃশেষিত করে। একদিকে প্রশাসনিক শক্তির ভয় অন্যদিকে ধর্মীয় আফিমের প্রয়োগে প্রতিরোধের ভাষা হারায় শ্রমিক শ্রেণি। শ্রম-শ্রম কেবলমাত্র শ্রম, তার ওপর ওভারটাইম, তার ওপর ধর্মীয় আবেগ, তার ওপর নেশার মৌতাত এবং সবশেষে কিছুতেই কাজ না হলে কুকুরমারা চাবুকের ভয় ফলে শ্রমিকরা প্রতিবাদটা করবে কীভাবে আর কখনই বা করবে?

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 548 - 557
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> “যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে সে রাজার সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে রাখে। সে ধর্ম বিষকন্যার মতো; আলিঙ্গন করে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ করে সে মারে। শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেননা তার মার আরামের মার।”[৫]

রক্তকরবী নাটকের নাট্য কাহিনি যে নগরকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে তা হলো যক্ষপুরী। এই যক্ষপুরী একটি শিল্পনগরী, এখানে একটি সোনার খনি আছে। এই সোনার খনির মালিক হলেন মকররাজ। এই নাটকের প্রস্তাবনায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী — এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে দ্বন্দ্বই এই নাটকের বিষয়বস্তু। কর্ষণজীবী সভ্যতার প্রতিনিধি হল নন্দিনী ও তার পক্ষে আছে বিশুপাগল, কিশোর এবং রঞ্জন আর আকর্ষণজীবী সভ্যতার প্রতিনিধি হল যক্ষপুরীর মকররাজ— যিনি জালের আড়ালে স্বেচ্ছাবন্দী। তাঁর পক্ষে আছে সর্দারেরা, অধ্যাপক, গোঁসাই, পুরাণবাগীশ প্রভৃতি। এই দুই পক্ষের দ্বন্দ্বের মধ্যে নন্দিনী কীভাবে আপন প্রভাব বিস্তার করে রাজাকে উদ্ধার করল এবং প্রাণহীন যক্ষপুরীতে সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রাণের স্পর্শ নিয়ে এল এ-নাটকে সে কথাই বলা হয়েছে।

এক সময়কার কৃষি-সমৃদ্ধ রাজ্য এখন খনি-সমৃদ্ধ রাজ্যে পরিণত। প্রজাদের শ্রমিক বানিয়ে রাজা তাদের জীবনের বিনিময়ে সোনার তাল জমাচ্ছেন এবং নিজের শক্তি ও আয়ু বাড়িয়ে চলেছেন। রাজার সঙ্গে বাইরের জগতের কোন যোগাযোগ নেই। প্রজাদের সঙ্গে রাজার যোগাযোগ না থাকলেও রাজার শাসনে কঠিন ভূমিগর্ভে খনক শ্রমিকদের খাটাবার জন্য নানা শ্রেণির কর্মচারী নিযুক্ত আছে। যক্ষপুরীর শিল্প-সংস্থায় কাজ করার জন্য গ্রাম থেকে মানুষদের আনা হয়েছে। সেইসব মানুষরা মাটির নিচ থেকে তাল তাল সোনা খোদাই করে মাটির ওপরে নিয়ে আসে। তাদের সেই তাল তাল সোনা গিয়ে জমা হয় মকররাজের কোষাগারে। শ্রমিকরা তাদের শ্রমের বিনিময়ে খাওয়া থাকার নিশ্চয়তাটুকু পায় কিন্তু তাদের শ্রম দ্বারা উত্তোলিত দ্রব্যের উপর তাদের কোনো মালিকানা নেই। শ্রমিকরা যাতে কাজে ফাঁকি দিতে না পারে সেজন্য রাজা সর্দারদের নিয়োগ করেছেন। সর্দাররা খোদাইকরদের কাজ পরিদর্শন করে। সোনার খনিতে প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে অধ্যাপককে। খোদাইকরদের চিকিৎসার সুবিধার জন্য চিকিৎসককে নিয়োগ করা হয়েছে যাতে শ্রমিকরা অসুস্থ হলে একদিনও কাজ বন্ধ না হয়। খোদাইকরদের ধর্মাচরণের জন্য কাজ করতে ও তাদের নাম-গান শোনাতে আসেন কেনারাম গোঁসাই— যাতে তারা বিদ্রোহের পথে না যায়।

যক্ষপুরীর কোনও শ্রমিকই তাদের ব্যক্তি-নামে পরিচিত নয়। প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্ব চাপা পড়ে গেছে তাদের সংখ্যা-নামে এবং পেশাগত নামে। সর্দার এর উক্তি—

> “ওই যে টঠ পাড়ায় যেখানে ৭১ট হচ্ছে মোড়ল। মূর্ধন্য ণ-এর ৬৫ যেখানে থাকে তার বাঁয়ে ঐ পাড়ার শেষ।”[৬]

আবার অধ্যাপক, চিকিৎসক, পুরাণবাগীশ প্রভৃতি বুঝিয়ে দেয় কর্মীদের পেশাগত নাম। যক্ষপুরীতে ওভারটাইমেরও ব্যবস্থা আছে। বারো ঘন্টার পর চার ঘন্টা ওভারটাইম করতে হয় ফাগুলালকে। বিশু বলে—

> “ওই যে ফাগু হতভাগা বারো ঘন্টার পরে আরও চার ঘন্টা যোগ করে খেটে মরে, তার কারণটা ফাগুও জানেনা, তুমিও জানো না অন্তর্যামী জানেন।”[৭]

যক্ষপুরীর খনি অঞ্চলের শ্রমিকরা কোনো ব্যক্তি স্বাধীনতা পায় না। শিশুশ্রমিক কিশোর সমস্ত দিন কেবল সোনার তাল খুঁড়ে আনলেও তার কোনো স্বাধীনতা নেই যে একটু সময়ের অবসরে নন্দিনীর পছন্দের ফুল রক্তকরবী তাকে তুলে এনে দেবে, তবুও কিশোর প্রতিজ্ঞা করে নন্দিনীকে বলে—"ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেব।”[৮] চন্দ্রা যখন গ্রামে ফিরতে চেয়ে সর্দারের কাছে ছুটি চায় তখন সর্দার বলে—

> “কেন? যে বাসা দিয়েছি সে তো খাসা, বাড়ির চেয়ে অনেক ভালো। সরকারি খরচে চৌকিদার পর্যন্ত রাখা গেছে।”[৯]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 548 - 557
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ফলে এর থেকে বোঝা যায় যে বাড়ি থেকে বাসায় এসে অর্থাৎ গ্রাম থেকে যক্ষপুরীতে এসে তাদের সকলেরই বেরোবার পথ বন্ধ হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই বন্দী হয়েছে। এদের ইচ্ছা না থাকলেও রাজা নিজের প্রয়োজনে এদের জোর করে ধরে রেখেছে।

যক্ষপুরীতে মানুষকে শোষণ করে নিঃশেষ করে দেওয়া হয়। কিন্তু যাতে মানুষ তার অধিকারের ব্যাপারে সচেতন না হয় তার জন্য তাঁকে দেওয়া হয় মদ। বিশুর উক্তিতে বোঝা যায় —

> "সেই নীল চাঁদোয়ার নীচে খোলা মদের আড্ডায়! রাস্তা বন্ধ। তাই তো এই কয়েদখানার চোরাই মদের ওপর এমন ভয়ঙ্কর টান। আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ—"[১০]

আবার মদ দিয়েও যদি কাজ না হয়, ভোলানো না যায় তাহলে তাকে দেওয়া হয় মন্ত্র। তাতেও যদি কাজ না হয়, গজ্জুর মতো যদি কেউ অবস্থার বিরুদ্ধে যায় তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হয়। কাজ-কামাই করলে যক্ষপুরীর সর্দাররা টের পেয়ে যায় এবং যে কাজে ফাঁকি দেয় তার পেছনে ডালকুত্তা লাগিয়ে দেওয়া হয়। যারা অবস্থার বিরুদ্ধে যায় না, যারা বারো ঘন্টা কাজ করে, তার ওপর ওভারটাইম করে, মদ খায় এবং মন্ত্রকে মেনে নিয়ে মানবতা খুইয়ে শোষিত হয়েই চলে তাদেরকে হতে হয় 'রাজার এঁটো'। অনুপ, শকলু, কঙ্কু রাজার এঁটোতে পরিণত হয়েছে। এদের মাংস-মজ্জা-মন-প্রাণ আছে বলে মনেই হয় না। শোষণের পাকচক্রে ওরা আর মানুষ নেই, মানুষের কঙ্কালে পরিণত হয়েছে। নন্দিনীর কথায় –

> "লোহাটা ক্ষয়ে গেছে কালো মর্চেটাই বাকি!"[১১]

এই যক্ষপুরীতে প্রাণের কোনো স্থান নেই। এখানে সব মানুষের পূর্ণ অস্তিত্ব ভগ্ন অস্তিত্বে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই ভগ্ন অস্তিত্বময় যক্ষপুরীর রাজা মকররাজ পূর্ণ অস্তিত্বময় নন্দিনীকে আনলেন অকাজের প্রয়োজনে। নন্দিনী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলছেন —

> "মাটি খুঁড়ে যে পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার নয়; মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের যেখানে রূপের নৃত্য যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের সেই সহজ সৌন্দর্যের।"[১২]

যক্ষপুরীতে এসে নন্দিনী লক্ষ করে যে প্রত্যেকটি মানুষ তাদের মানবতা খুইয়ে যন্ত্রে পরিণত হয়েছে কিন্তু ব্যক্তিগত মানুষ সম্পূর্ণ মরে যায়নি। জালের আড়ালে থাকা রাজা থেকে কিশোর, বিশু, ফাগুলাল পর্যন্ত নন্দিনীর সংস্পর্শে এসে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে।

সুতরাং আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেল রক্তকরবী নাটকে আধুনিক ইউরোপীয় ধনতন্ত্র, বিজ্ঞান সাধনার শক্তি বলে প্রকৃতি ও মানুষের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের দম্ভ এবং নিয়মতন্ত্র-সর্বস্ব পুঁজিবাদী যান্ত্রিক শাসন ও শোষণ ব্যবস্থার স্পষ্ট রূপচিত্র। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে খনি অঞ্চলের সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির মধ্য দিয়ে ধনতন্ত্রবাদের নগ্ন প্রতিকৃতিটা তুলে ধরেছেন। এ নাটকে আকর্ষণজীবীদের সঙ্গে কর্ষণজীবীদের যে দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথ সেখানে নন্দিনী চরিত্র নিয়ে এসে সেই দ্বন্দ্ব থেকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন এ প্রসঙ্গে ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন—

> "আধুনিক কালের 'সভ্য' দেশে ধনমত্ত ও শক্তিলুব্ধ ব্যক্তিমানুষ পরিচালিত জনপিণ্ড যে জীবনের ক্ষেত্রে ইতস্তত তাড়িত হইতেছে তাহাতে প্রানের ও প্রকৃতির সহজ দান ও সরল সৌন্দর্য উপেক্ষিত এবং রসবোধ সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছি। ইহারই প্রতিবাদে রক্তকরবীতে ধনের উপর ধান্যের শক্তির উপরে প্রেমের এবং মৃত্যুর উপরে জীবনের জয়গান ধ্বনিত। লোভের ভূমি গর্ভে সুড়ঙ্গ না কাটিয়া জ্ঞান ও শক্তি যদি প্রকৃতির সৌন্দর্যের মোহমুক্ত ক্ষেত্রে জীবনের সঙ্গে মিলিত হয় তবেই কল্যাণে সার্থকতা। — ইহাই রক্তকরবীর বক্তব্য।"[১৩]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের অপর একটি বিখ্যাত নাটক 'মুক্তধারা'-য় আমরা লক্ষ করি সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদের নগ্ন স্বরূপ। সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য হলো শোষণ। কিছু সংখ্যক মানুষের ফুলে-ফেঁপে ওঠার জন্য বেশিরভাগ

মানুষের নিঃস্ব হওয়া প্রয়োজন - এ কথাই বলে সাম্রাজ্যবাদ। 'মুক্তধারা' নাটকের সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ কিভাবে খুলে গেছে তা আমরা বিচার করে দেখব।

মুক্তধারা নাটকের রাজার নাম রণজিৎ, রাজ্য উত্তরকূট। রণজিতের পিতামহ প্রাগজিৎ দক্ষিণ দেশ শিবতরাই-এর স্বাধীনতা হরণ করেছিল। তিন পুরুষ ধরে শিবতরাইকে বশ্যতা মানাবার বহু চেষ্টা করেছিল। এহেন শিবতরাইয়ের অর্থ উপার্জনের প্রধান মাধ্যম হলো পশম রপ্তানি ও চাষবাস। শিবতরাই যে পথ দিয়ে পশম রপ্তানি করত সেই নন্দী সংকটের পথ প্রাগজিৎ বন্ধ করে দিয়েছিল। পথ বন্ধ করে শিবতরাইয়ের পশম বিক্রির দায়িত্ব নিয়েছিল উত্তরকূট। অন্যের উৎপাদিত পণ্যের উপর খবরদারি সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিবতরাইকে এভাবে শোষণ করে উত্তরকূটের অন্নবস্ত্র হয়ে উঠেছিল সুলভ। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীর বশ্যতা স্বীকার করেনি শিবতরাই। তাই রণজিতের রাজত্বে পঁচিশ বছরের চেষ্টায় মুক্তধারাকে বেঁধেছে যন্ত্ররাজ বিভূতি। শিবতরাইয়ের তৃষ্ণার জল এবং চাষের জলকে এবার নিজেদের ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করবে উত্তরকূট। ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধা নিয়ে রাজ্যের সীমানায় বাঁধ দেওয়ার ফলে প্রতিবেশী রাজ্য শিবতরাইকে জল দেওয়া বা না দেওয়া উত্তরকূটের মর্জির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। সাম্রাজ্যবাদের এও একটি বীভৎস রূপ। তৃষ্ণার জল উত্তরকূটের মর্জির অধীনে হওয়ায় শিবতরাই বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য, কারণ বশ্যতা মেনে চললে জল পাবে নইলে শুকিয়ে মরবে। ডান হাতের কার্পণ্য দিয়ে পথ এবং জল বন্ধ করে বাঁ হাতের বদান্যতায় বাঁচিয়ে রাখা হবে শিবতরাইকে, কারণ উত্তরকূটের সাম্রাজ্যবাদী রাজা জানে—

> "বিদেশি প্রজাদের সেই চাপে রাখাই রাজনীতি।"[14]
>
> "যে প্রজারা দূরের লোক তাদের কাছে গিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করলে তাদের ভয় ভেঙে যায়। প্রীতি দিয়ে পাওয়া যায় আপন লোককে, পরকে পাওয়া যায় ভয় জাগিয়ে রেখে।"[15]

দেবতার দান মুক্তধারাকে বন্দী করে সাম্রাজ্যবাদীরা মনে করে উত্তরকূটের জয় উত্তরকূটের পুর-দেবতাদের জয়। সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা এতদূর যে দেবতাকে নিজের সাম্রাজ্য বলতে পিছপা হয় না। তারা মনে করে তৃষ্ণা'র শূলে শিবতরাইকে বিদ্ধ করে উত্তরকূটের সিংহাসন তলায় ফেলে রেখে যাবে দেবতা। বর্তমানে কাবেরী ইস্যু বা গঙ্গা-তিস্তার জলবণ্টনেও অনেকটা একই চিত্র দেখতে পাই।

শুধু মুক্তধারা বা নন্দী সংকটের পথ বন্ধ-ই নয়, উত্তরকূটের মানুষদের শিবতরাইয়ের বিরুদ্ধে বিভীষিকা হয়ে ওঠার জন্য দেওয়া হয় উগ্র-জাতীয়তাবাদের শিক্ষা। ঔপনিবেশিক শক্তিকে উপনিবেশের প্রতি শেখানো হয় প্রবল ঘৃণা, এবং তাদের প্রতি সহানুভূতির পথ আটকে দেবার জন্য প্রয়োজন হয় উগ্র-জাতীয়তাবাদের। এই উগ্র-জাতীয়তাবাদ হল সাম্রাজ্যবাদেরই আরেক রূপ।

উত্তরকূটের গৌরবে গৌরব করার শিক্ষা ছাত্রদের শেখায় তাদের গুরু। তাই বিধাতার বিরুদ্ধে হাত চালিয়ে বিধাতা হতে ইচ্ছুক যন্ত্ররাজ বিভূতিকে শিরোপা দেওয়ার দিনে ছাত্রদের নিয়ে আনন্দ উপভোগ করতে যাচ্ছেন গুরু। অন্যের তৃষ্ণার জল বন্ধ করার এ-এক পৈশাচিক আনন্দ, ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা। বিভূতি শিবতরাই-এর খাবার জল বন্ধ করে দিয়েছে। রাজা ছেলেদের জিজ্ঞেস করছেন —

> "রণজিৎ। বিভূতি কী করেছে এরা সবাই জানে তো?
> ছেলেরা। (লাফাইয়া হাত তালি দিয়া) জানি, শিবতরাইয়ের খাবার জল বন্ধ করে দিয়েছেন।
> রণজিৎ। কেন দিয়েছেন?
> ছেলেরা। (উৎসাহে) ওদের জব্দ করার জন্য।
> রণজিৎ কেন জব্দ করা?
> ছেলেরা। ওরা যে খারাপ লোক।
> রণজিৎ। কেন খারাপ?
> ছেলেরা। ওরা খুব খারাপ ভয়ানক খারাপ সবাই জানে।

রণজিৎ। কেন খারাপ তা জান না?
গুরু। জানে বৈকি, মহারাজ। কী রে, তোরা পড়িসনি— বইয়ে পড়িস নি— ওদের ধর্ম খুব খারাপ।
ছেলেরা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদের ধর্ম খুব খারাপ।
গুরু। আর ওরা আমাদের মতো— কী বল না— (নাক দেখাইয়া)
ছেলেরা। নাক উঁচু নয়।
গুরু। আচ্ছা, আমাদের গণাচার্য কি প্রমাণ করে দিয়েছেন— নাক উঁচু থাকলে কী হয়?
ছেলেরা। খুব বড় জাত হয়।
গুরু। তারা কী করে? বল না— পৃথিবীতে বল— তারাই সকলের উপর জয়ী হয়, না?
ছেলেরা। হ্যাঁ, জয়ী হয়।
গুরু। উত্তরকূটের মানুষ কোনদিন যুদ্ধে হেরেছে জানিস?
ছেলেরা। কোনদিনই না।
গুরু। আমাদের পিতামহ মহারাজ প্রাগজিৎ দুশো তিরানব্বই জন সৈন্য নিয়ে একত্রিশ হাজার সাড়ে সাতশো দক্ষিণী বর্বরদের হটিয়ে দিয়েছিলেন না?
ছেলেরা। হ্যাঁ দিয়েছিলেন।”[১৬]

এভাবেই সরাসরি রাষ্ট্র পরিচালিত উগ্র-জাতীয়তাবাদের শিক্ষা ছাত্রদের শেখানো হয়। মহারাজা বুঝে নিতে চান তাঁর দেশের ছাত্রসমাজ তাঁরই মতো (তথাকথিত!) দেশপ্রেমিক কী না? উপরের সংলাপ পড়ে মনে পড়ে যায় ‘হীরক রাজার দেশে’ সিনেমার মগজধোলাইয়ের কথা। মেকি দেশপ্রেমের মগজ ধোলাই কীভাবে মানুষকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, মানুষকে ঘৃণা করতে শেখায় তারই জ্বলন্ত প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের এই নাটকটি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ প্রসঙ্গে উগ্র-জাতীয়তাবাদের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, যার ফলে ইউরোপীয় দেশগুলি একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মেতে ওঠে। ‘মুক্তধারা’-তে যেন তারই একটি প্রতিলিপি আঁকা হয়েছে।

> “উত্তরকূটের বাইরে যে হতভাগারা মাতৃগর্ভে জন্মায় একদিন এই সব ছেলেরাই তাদের বিভীষিকা হয়ে উঠবে।”[১৭]

—এই মহান দায়িত্ব নিয়েছে উত্তরকূটের পূজনীয় গুরুদেব। বর্বর সাম্রাজ্যলোভী, অত্যাচারী যে মানুষগুলোকে উগ্র-জাতীয়তাবাদের শিক্ষা দিয়ে তৈরি করে গুরুরা রাষ্ট্র তাদের ব্যবহার করে। এই ছাত্রদের পূর্বসূরিদেরও উগ্র-জাতীয়তাবাদ শেখানো হয়েছে যার প্রমাণ উত্তরকূটের নাগরিকদের কথোপকথন। উত্তরকূটের নাগরিকরা যখন শিবতরাই-এর গণেশকে যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়ধ্বনি দিতে বলে তখন গণেশ তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে, গণেশকে তারা ব্যঙ্গ করে এবং বলে—

> “তোদের পিপাসার জল যে তার হাতে সে দয়া না করলে অনাবৃষ্টির ব্যাঙগুলোর মতো শুকিয়ে মরে যাবি।”[১৮]

এতেই শেষ নয়, অভিজিৎ তিন পুরুষ ধরে বন্ধ থাকা নন্দী সংকটের পথ খুলে দিলে উত্তরকূটের ভোজন পাত্রের তলাটা খসে যায়। স্বার্থে ঘা পড়ে উত্তরকূটের উগ্র-জাতীয়তাবাদী মানুষের। তাই নন্দী সংকটের পথ আবার বন্ধ করার জন্য অমাবস্যার রাত্রিতে তারা লোক জোটায়। যারা সে কাজে যেতে রাজি নয় তাদের প্রতি দয়া দেখাতে পারেনা উগ্রজাতীয়তাবাদীর দল। হুব্বা এবং উত্তর ভৈরবের মন্দিরের ঘন্টা বাদক লছমনকে মর্জির বিরুদ্ধে প্রায় জোর করে ধরে নিয়ে যায়। লছমনের স্ত্রীর রোগের কথাও তাদের কানে ওঠেনা। এরইমধ্যে বনোয়ারি যখন বলে—

> “শিবতরাইয়ের লোকের সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই। ওরা আমাদের শত্রু নয়।”[১৯]

তখন কঙ্কর তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত বনোয়ারি বলে—

> "আমি এক পা নড়বে না।"[২০]

তখন তাকে বাঁধবার হুকুম দেয় কঙ্কর। উগ্র জাতীয়তাবাদী আচরণ ও কথাবার্তা শোনা যায় কঙ্করের মুখে—

> "উত্তরকূটের সেবায় যারা অনিচ্ছুক তাদের দমন করা একটা কাজ, সময় থাকতে এই কথাটা বুঝে দেখো।"[২১]

একই জায়গায় মানুষ হয়েও কঙ্কররা কোনো ব্যক্তিকে চেনে না। বাঁধ বাঁধার কাজে মজুর না পাওয়া গেলে রাজার আদেশে চণ্ডপত্তনের প্রত্যেক ঘর থেকে আঠারো বছরের উপর বয়সের ছেলেকে জোর করে তুলে আনা (জনাই গাঁয়ের অম্বার ছেলে সুমনও আছে) উগ্র-জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের এক রূপ। বিশ্বাস আর মানবতার মূলে আঘাত করেই জয়ের গৌরব করে চলেছে উগ্র-জাতীয়তাবাদ। রণজিৎ বিশ্বাস করে না কাকা বিশ্বজিৎকে, প্রজারা বিশ্বাস করে না রাজাকে, সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা করে অভিজিতের সঙ্গে, বিভূতি সন্দেহ করে বিশ্বস্ত চরদের এভাবে সন্দেহ আর অবিশ্বাসের বাতাবরণে মুক্তধারার সাম্রাজ্যবাদ ও উগ্র-জাতীয়তাবাদের স্বরূপটি স্পষ্ট করে।

উত্তরকূটের মানুষদের পাশাপাশি শিবতরাইয়ের মানুষরাও উগ্র-জাতীয়তাবাদের শিক্ষায় শিক্ষিত। তারা মনে করে উত্তরকূটের মানুষগুলো যেন একতাল মাংস নিয়ে গড়া, বিধাতা গড়তে শুরু করে আর ফুরসত পাননি। তাদের কাপড় পরার ধরন "যেন নিজেকে বস্তায় বেঁধেছে।"[২২] এমনকি শিবতরাইয়ের লোকেরা মনে করে উত্তরকূটের লোকেদের শিক্ষা পর্যন্ত নেই তাদের অক্ষরগুলো উইপোকার মতো। উত্তরকূটের মতোই শিবতরাই-এর একটি গুরু আছে যে কিনা একই রকম জাতীয়তাবাদী সুরে বলে—

> "ওদের ছায়া মাড়ানো নৈব নৈব চ।"[২৩]

শিবতরাইয়ের মানুষেরা ভাবে যে সমুদ্রমন্থনের পর দেবতার ভাঁড় থেকে গড়িয়ে পড়া অমৃতের মাটি দিয়ে শিবতরাই-এর পুরুষরা গড়া। আর দৈত্যরা যখন উচ্ছিষ্ট ভাঁড় চেটে চেটে নর্দমায় ফেলে দিল তখন সেই ভাঁড়-ভাঙ্গা পোড়া মাটি দিয়ে উত্তরকূটের মানুষকে গড়া হয়।

> "তাই ওরা শক্ত, কিন্তু থুঃ— অপবিত্র।"[২৪]

অভিজিৎ নন্দীসংকটের পথ খুলে দিয়েছে, সেই বন্দী ধারাকে করেছে মুক্ত। এই অভিজিৎ উত্তরকূট বা শিবতরাই-এর কেউ নয়, তার জন্ম মুক্তধারার ঝরনা তলায় অর্থাৎ দুই রাজ্যেরই সীমানায় — মনুষ্য বর্জিত এলাকায়। তাই তার মধ্যে জাতীয়তাবাদের চর্চা নেই সে চর্চা করেছে মনুষ্যত্বের এবং হয়ে উঠেছে প্রাদেশিক বা দেশীয় নয় আন্তর্জাতিক চরিত্র। উত্তরকূট বা শিবতরাইয়ের স্বার্থের সঙ্গে সে বদ্ধ নয়। সে নিজে মুক্ত বলেই শিবতরাইকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছে, আবার একইভাবে শোষকের লজ্জা থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছে উত্তরকূটকে। এভাবেই সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তাবাদী গর্বোদ্ধত শক্তির শোষণের ও তার থেকে মুক্তির ছবি আঁকা হয়েছে মুক্তধারা নাটকে। প্রসঙ্গত ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন—

> "শুধু আমাদের নয় ইউরোপ-এশিয়া-আমেরিকায় ভবিষ্য মানুষের মরণ-বাচনের সমস্যার শুভ সমাধানের সংকেত এই ভাবনাট্যটিতে আছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা বৈজ্ঞানিক মানুষের যান্ত্রিক বুদ্ধিকে চণ্ড করিয়া নামাইয়াছে। সেই সঙ্গে সংকীর্ণ জাতিগত স্বার্থচেতনা ও বণিক-বৃত্তি মিলিয়া পৃথিবীর বক্ষে যে পীড়ন যন্ত্র চালাইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে মানুষের শুভবুদ্ধি ও কল্যাণ প্রেরণা একদিন জাগ্রত ও জয়ী হইবে। মানুষ যন্ত্রের দাস না হইয়া যন্ত্র মানুষের দাস হইবে। — ইহাই মুক্তধারার মর্মকথা।"[২৫]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে স্বরাজের আশায় ভারতবাসী সাহায্য করেছিল ইংরেজকে। এমনকি ইংরেজের জয়ে ভারতবাসী উল্লাস পর্যন্ত করেছিল। ১৯১৮ সালে স্টার থিয়েটার অভিনয় করে ‘খাসদখল’। সে-রাতের অভিনয়কে ঘোষণা করা হয় — ‘victory celebration performance’ মনোমোহন থিয়েটারে অভিনয় হয় ‘ব্রিটিশ বিজয়’, মিনার্ভাতে ‘বিজয় উল্লাস’। কিন্তু ইংরেজ সরকার স্বরাজ দেওয়া দূরে থাক যুদ্ধ শেষে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই আমাদের দিয়েছিল জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। রবীন্দ্রনাথ এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করে ব্রিটিশের দেওয়া নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। সর্বত্র লোভ, মূল্যবোধহীনতা আর অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয় গোটা পৃথিবী জুড়ে, ঠিক যেমনটি হয়েছে মুক্তধারা নাটকে। উত্তরকূটের অহংকার, লোভ, শিবতরাইয়ের প্রতি ঘৃণা শুধু উত্তরকূটবাসীর নয় সমস্ত সাম্রাজ্যবাদীর, সব কালের, সমগ্র দুনিয়ার। আজকের দিনেও ইরাক-ইরানের ওপর মার্কিন আক্রমণ বা প্রাদেশিক হিংসা যেমন ভারত-পাকিস্তান হিংসা উত্তর কোরিয়া-দক্ষিণ কোরিয়ার হিংসা, হিন্দু-মুসলমান-ইহুদি-খ্রিস্টান জাতিবিদ্বেষ মুক্তধারা নাটকের সত্যকে এখনো প্রাসঙ্গিক করে রেখেছে। সমসাময়িক বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, ফ্যাসিবাদী শক্তির লোভ-হিংসা-অহংকার-মিথ্যাচার এবং শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অসহায়তার যে বাস্তবকে জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ— তারই নাট্যরূপ মুক্তধারা। আজকের ভিন্ন ধরনের ভিন্ন চরিত্রের সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদের যুগে মুক্তধারা নাটকের নিবিড় পাঠের প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য।

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, জীবন, উচ্চ-মাধ্যমিক আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব, ছায়া প্রকাশনী, কলকাতা, জুন ২০০১, তৃতীয় সং, পৃ. ১৪৭
২. মুখোপাধ্যায়, জীবন, স্বদেশ পরিচয়, নবভারতী প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০০০, পরিমার্জিত দ্বাদশ সং, পৃ. ৫০৫-৫০৬
৩. সেন, সুকোমল, ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (১ম খন্ড), কলকাতা, ১৯৮৬, তৃতীয় সং, পৃ. ১৭৩
৪. মুখোপাধ্যায়, জীবন, স্বদেশ পরিচয়, নবভারতী প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০০০, পরিমার্জিত দ্বাদশ সং, পৃ. ৫০৪-৫০৫
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রাশিয়ার চিঠি, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৬৪, পৃ. ৩০৮
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রক্তকরবী, বিশ্বভারতী, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪০৩, পৃ. ৪১
৭. তদেব, পৃ. ৩৫
৮. তদেব, পৃ. ১১
৯. তদেব, পৃ. ৩৯
১০. তদেব, পৃ. ৩৪
১১. তদেব, পৃ. ৭৪
১২. তদেব, পৃ. ১১৯
১৩. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খন্ড), আনন্দ, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৭, প্রথম আনন্দ সং, পৃ. ২৩৯
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র নাট্য সংগ্রহ (দ্বিতীয় খন্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, মাঘ ১৪০৬ (প্রথম প্রকাশ), পৃ. ১৫
১৫. তদেব, পৃ. ১৫
১৬. তদেব, পৃ. ১৮
১৭. তদেব, পৃ. ১৮
১৮. তদেব, পৃ. ২৯
১৯. তদেব, পৃ. ৪২
২০. তদেব, পৃ. ৪৩
২১. তদেব, পৃ. ৪৩
২২. তদেব, পৃ. ২৮

২৩. তদেব, পৃ. ২৮
২৪. তদেব, পৃ. ২৮
২৫. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খন্ড), আনন্দ, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৭, প্রথম আনন্দ সং, পৃ. ২৩০

Bibliography:

ঘোষ, শঙ্খ, কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০০১, (পঞ্চম সংস্করণ)
চ্যাটার্জি, শিবব্রত, রবীন্দ্রনাথের নাটকের সংলাপ, জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭০
জামান, মানসী, বাংলা নাটক (১৯৪০-৬০) আর্থসামাজিক দৃশ্যপট, জগৎমাতা পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯২
সিকদার, অশ্রুকুমার, রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য, আনন্দ(প্রথম সং), কলকাতা, ২০১০